International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-VI, November 2023, Page No.115-123
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.115-123

জৈন চিন্তায় জীবের বন্ধন ও মুক্তি

জয়ন্ত বায়েন

রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বিভাগ -১, দর্শন বিভাগ, রামপুরহাট মহাবিদ্যালয়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The discussion of the bondage and liberation of the 'soul' occupies a very important place in Indian thougth. Like other Indian philosophies except charvaka, the main aim of Jaina philosophy is the 'liberation' (moksha) of the Jiva or soul. According to Jaina, the substance that has consciousness is called 'Jiva' or 'soul'. Jiva is inherently perfect, but it is not manifested because of the obstacles of karma. When karma pudgala connects with the soul, the bondage of the Jiva is created. According to Jaina, asrava is the cause of bondage. The way in which karma pudgala enters into the soul is called 'asrava'. Jainas said that, the influx of this karma is stopped by practicing three gems - Samyag darsana (Right faith), Samyag jnana (Right knowledge), and Samyag caritra (Right conduct).this is called 'samvara',then there is annihilation of past karma ,which is called 'nirjara'. Samyag darsana is respect for truth. Samyag jnana is the understanding of the real nature of the soul and the world. Samyag caritra is indulging in berevolent behavior and refraining from unwholesome behavior. By practicing this three jewels, the desires of the Jiva are restrained, passion is removed, the soul becomes free from its bondage to karma pudgala and attains liberation. In this paper, I will discuss about the bondage and liberation of the Jiva, according to Jaina ethics.

Keywords: Jiva or soul, Mukti (Liberation), Bandhan (Bondage), Triratna, karma pudgala, Asrava.

'জীব' বা 'আত্মার' বন্ধন ও মুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা ভারতীয় দর্শনে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান আমাদের এই ভারতবর্ষে উষাকাল থেকে সত্যদ্রষ্টা দার্শনিকগণ উপলব্ধি করেছেন যে, আমাদের জীবন মাত্রই জড়া -মরণ দুঃখ ক্লিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন থেকে নিবৃত্তির মার্গ অনুসন্ধানে ভারতীয় দার্শনিকগণ ডুব দিয়েছেন আত্মসাগরে। বেদ বিরোধী জৈন দর্শনেও এরূপ চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। জৈন নীতিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্যই হল জীব বা আত্মার বন্ধন মুক্তি। বন্ধন থেকে জীবের মুক্তির কথা জৈনগনের কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হয়েছে। বন্ধন থাকলে তার থেকে নিবৃত্তির প্রশ্ন জাগে। তাই এই প্রবন্ধে জৈন নীতিশাস্ত্রের আলোকে প্রথমে জীবের বন্ধন সম্পর্কে এবং পরে জীব কিভাবে বন্ধন থেকে

মুক্তি লাভ করে তা আলোচনা করা হয়েছে। তবে তার পূর্বে জৈন দর্শনের আঙ্গিকে জীবের স্বরূপ জানা আবশ্যক।

জীব বা আত্মার স্বরুপঃ জৈন অধিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো 'দ্রব্য' তত্ত্ব। উমাস্বামী 'দ্রব্য' প্রসঙ্গে বলেছেন -"গুণপর্যায়বঢ় দ্রব্যম"[১]। অর্থাৎ দ্রব্য হচ্ছে গুণ ও পর্যায় বিশিষ্ট সৎ পদার্থ। জৈনগন সর্বপ্রথম দ্রব্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা - অস্তিকায় এবং অনস্তিকায় দ্রব্য। যে সব দ্রব্য দেশ বা বিস্তৃতি জুরে অবস্থানকরে না, তাহল অনস্তিকায় দ্রব্য। আর যেসব দ্রব্য দেশ বা স্থানে পরিব্যাপ্ত থাকে, তাকে বলা হয় অস্তিকায় দ্রব্য। অস্তিকায় দ্রব্য দু-ভাগে বিভক্ত যথা - জীব এবং অজীব। জৈনগন বলেন, জীব ও অজীব এই দুটি পদার্থের দ্বারা সমগ্র জগৎ গঠিত। যার চৈতন্য বিদ্যমান তাহল জীব, আর যার চৈতন্য নেই তা অজীব পদবাচ্য।

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে যাকে 'পুরুষ' বা 'আত্মা' বলা হয় জৈনগণ তাকেই 'জীব' নামে অভিহিত করেছেন। জৈন মতে, চৈতন্য যে দ্রব্যের স্বরূপ ধর্ম সেই দ্রব্য হল জীব। চৈতন্য হল জীবের স্বরূপ। প্রতিটি জীবের মধ্যে চৈতন্য সর্বদা বিদ্যমান, তবে সর্বক্ষেত্রে তা সমভাবে ব্যক্ত হয় না। জীব বা আত্মা স্বরূপত সর্বজ্ঞ হলেও সকল জীবের মধ্যে এই সর্বজ্ঞত্বের প্রকাশ হয় না। জৈন মতে, জীব স্বরূপত অনন্ত দর্শন, অনন্ত সুখ, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত বীর্যের অধিকারী। একমাত্র মুক্ত জীবের মধ্যেই এই ধর্ম গুলি লক্ষ্য করা যায়। সংসারে আবদ্ধ জীবের মধ্যে এই ধর্মগুলি কর্মপুদ্গালের দ্বারা আবৃত থাকে। জৈন মতানুসারে, জীব বা আত্মা তার কর্ম অনুসারে দেহ ধারণ করে এবং চৈতন্য বা জ্ঞানলাভ করে। যার ফলস্বরূপ জীবের চৈতন্যের মাত্রাভেদ হয়।

জৈন মতে, জীব বা আত্মা অস্তিকায় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ জীব দেশ বা স্থান জুড়ে অবস্থান করে। জীব কর্ম পুদ্গালের প্রভাবে যে দেহ ধারণ করে, সেই দেহের আকৃতি জীবও ধারণ করে। দেহের আকার অনুসারে জীবেরও আকার হয়। জীব বা আত্মা সংকোচন ও প্রসারণে সক্ষম। আলো যেরূপ একটি কক্ষের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় এবং কক্ষের আকৃতি ধারণ করে, আত্মাও সেরূপ একটি সসীম দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে দেহাকৃতি ধারণ করে। স্বভাবতঃই ক্ষুদ্রকায় মশকের দেহ অপেক্ষা দীর্ঘকায় হস্তির দেহে জীবের বিস্তৃতি অনেক বেশি ব্যাপক। জীব দেহের সর্বাংশে বিরাজ করলেও তা দেহকে অতিক্রম করে না। অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত জীব নেই। জীব সসীম দেহের দ্বারাই সীমিত। তবে জীব দেহের সমবিস্তৃতি সম্পন্ন হলেও তা দেহের সাথে অভিন্ন নয়[২]। জৈনগণ বলেন, জড়বস্তু যেরূপ দেশ বা স্থান জুড়ে থাকে জীব বা আত্মা সেরূপ থাকে না। একই স্থানে দুটি জড়দ্রব্য একসঙ্গে থাকতে পারেনা, কিন্তু জীব থাকতে পারে। দুটি আলোক যেভাবে একই স্থানকে আলোকিত করে তোলে সেভাবে দুটি জীবও একই স্থানে অবস্থান করতে পারে। জৈন দার্শনিকগণ বলেন যে, আত্মা হচ্ছে জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। জীব নিত্য ও অপরিণামী। স্বরূপধর্ম চৈতন্যের দিক থেকে বিচার করলে জীব নিত্য ও অপরিনামী। কিন্তু পর্যায়ের দিক থেকে অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, কামনা, বাসনা ইত্যাদির দিক থেকে বিচার করলে জীব অনিত্য ও পরিবর্তনশীল। জৈন দর্শন অনুসারে, আত্মা অন্য বস্তুকে প্রকাশিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রকাশ করে, জীব বা আত্মা স্বয়ং প্রকাশমান।

জীবের শ্রেণীবিভাগ: জৈন মতে, জীব দুই ভাগে বিভক্ত, যথা- সংসারী জীব ও মুক্ত জীব বা সিদ্ধ জীব।

মুক্ত জীব: যে জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয় না অর্থাৎ যে জীবের জন্মেও নেই, মৃত্যুও নেই তাই হল মুক্ত জীব।

সংসারী জীব: যে জীব জন্ম থেকে জন্মান্তরে পরিভ্রমণরত অর্থাৎ যে জীব সংসার চক্রে আবদ্ধ থাকে সে জীবই হলো সংসারী জীব।সংসারী জীব আবার দুই ভাগে বিভক্ত- ত্রস এবং স্থাবর। গতিশীল জীব হল ত্রস আর গতিহীন জীব হলো স্থাবর।ত্রস জীব পাঁচ প্রকার যথা- (১) দুই ইন্দ্রিয় যুক্ত যেমন- কৃমি, শুক্তি, (২) তিন ইন্দ্রিয় যুক্ত- পিপীলিকা, জোঁক, (৩) চার ইন্দিয় যুক্ত- মাছি, মশা, (৪) পাঁচ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট- পশু, পক্ষী, এবং (৫) ছয় ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট- মানুষ।

জীব বা আত্মার বন্ধনঃ অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকগণের ন্যায় জৈনগণও ‘বন্ধন’ বলতে জীবের জন্মগ্রহণ বা দেহ ধারণ ও তার জন্য বিভিন্ন প্রকার এবং দুঃখ দুর্দশা ভোগকে বুঝিয়েছেন। কর্ম পুদ্গল আত্মার সঙ্গে সংযোগ হলে জীব দেহ ধারণ করে এবং দুঃক-কষ্ট ভোগ করে, যা জৈন মতে, ‘জীবের বন্ধন’ নামে পরিচিত। জৈন মতে, জীব ও আত্মা এক ও অভিন্ন। প্রতিটি জীব স্বরুপত পূর্ণ, অনন্ত দর্শন ,অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সুখ ও অনন্ত শক্তির আশ্রয় বা আধার। তবে জীবের এই গুণগুলি কর্মের বাধার জন্য অপ্রকাশিত অবস্থায় থেকে যায়। অনন্ত সম্ভাবনাময় জীব প্রতিবন্ধকতার আবরণ উন্মোচন করতে সক্ষম হলে স্বস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। মেঘ ও কুয়াশার আবরণ দূর হলে রবির কিরণ যেমন নিখিল জগতকে আলোকিত করে তেমনি কর্মের বাধা অপসৃত হলে জীব তার নিজের স্বরূপ লাভ করে।

জৈনগন বলেন, কর্মের জন্যই জীবের বদ্ধদশা, কর্মফল ভোগের কারণে জীব নবদেহ ধারণ করে। পূর্ব জন্মার্জিত কর্মের ফলে জীবের মধ্যে যেসব কামনা, বাসনা ও আসক্তির জন্ম হয়, সেগুলি পুদ্গল-পরমাণুকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে, ঐ কামনা, বাসনা, আসক্তির পরিতৃপ্তি লাভের জন্য জীব বা আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। কর্ম পুদগল বিন্যাসের ভিন্নতা অনুযায়ী জীবদেহও পৃথক পৃথক আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কর্মই দেহ বন্ধন এর কারণ। জৈন মতে, জীবের বন্ধন সৃষ্টিকারী প্রধান কর্ম আট প্রকার যথা- জ্ঞানাবরনীয় কর্ম, দর্শনাবরনীয় কর্ম, বেদনীয় কর্ম, মোহনীয় কর্ম, আয়ু-কর্ম, নামকর্ম, গোত্র কর্ম এবং অন্তরায় কর্ম। এই আট প্রকার কর্ম নিম্নে আলোচিত হলো-

1) **জ্ঞানাবরনীয় কর্ম:** যে কর্ম জীবের তত্ত্বজ্ঞান আবৃত করে তাহল জ্ঞানাবরনীয় কর্ম।
2) **দর্শনাবরনীয় কর্ম:** যে কর্ম দ্বারা জীবের দর্শন শক্তি বিঘ্নিত হয় তা দর্শনাবরনীয় কর্ম।
3) **বেদনীয় কর্ম:** এই কর্মের প্রভাবে সুখ দুঃখের অনুভূতি হয়।
4) **মোহনীয় কর্ম:** এই কর্ম মোহের উৎপন্ন করে জীবনকে অশুভ কর্মে প্রবৃত্ত করে।
5) **আয়ু কর্ম:** যে কর্মের প্রভাবে আত্মা বা জীবের নিজস্বরুপ আবৃত হয় এবং আয়ু নির্ধারিত হয় তা আয়ু কর্ম।
6) **নাম কর্ম:** যে কর্মের জন্য জীব পূর্ণ বা বিকল অঙ্গ - প্রত্যঙ্গাদি যশ বা অপযশ ইত্যাদি বহু বিচিত্রা প্রদত্ত হয় তা হল নাম কর্ম।
7) **গোত্র কর্ম:** এই কর্মের প্রভাবে জীব উচ্চ বা নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং
8) **অন্তরায় কর্ম:** যে কর্ম জীবকে শুভ কর্ম সম্পাদন করতে বাধা প্রদান করে সেই কর্ম হল অন্তরায় কর্ম।

উক্ত নানাবিধ কর্মের জন্য জীব কর্ম বন্ধন বা পুদগল - বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয় । যার ফলস্বরূপ জীব জন্ম - জন্মান্তর চক্রে আবর্তিত হয়।

জৈন নীতিশাস্ত্রে জীবের দুঃখের কারণকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা - (১) আস্রব এবং (২) বন্ধ

1) **আস্রব**: যে উপায়ে আত্মায় কর্ম পুদগলের অনুপ্রবেশ ঘটে জৈন দর্শনে তাকে আস্রব বলা হয়েছে। তত্ত্বার্থসূত্রানুযায়ী, কায়, বাক্য ও মনের কর্মই হলো 'যোগ'[৩]। এগুলিই হলো আস্রবের কারণ[৪]। কায়িক অশুভ কর্ম হলো- হিংসা, চৌর্য বৃত্তি ইত্যাদি। বাচিক অশুভ কর্ম- মিথ্যা বাক্য, কর্কশ ভাষণ প্রভৃতি এবং মানসিক অশুভ কর্ম হলো- দ্বেষ, লোভ প্রভূতি।
2) **বন্ধ**: জৈন মতে, জীব বা আত্মায় কর্মপুদগলের সংযুক্তি হচ্ছে 'বন্ধ'। তত্ত্বার্থসূত্রানুযায়ী বন্ধনের কারণ পাঁচটি[৫], এগুলি হলো- মিথ্যা দর্শন, অবিরতি, প্রমাদ, কষায় এবং যোগ।

মিথ্যা দর্শন: মিথ্যাত্বের অর্থ হচ্ছে ক্ষতিকর বা অনুপকারী বিশ্বাস। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই হল মিথ্যা দর্শন।

অবিরতি: 'অবিরতি' অর্থে আত্ম সংযমের অভাবকে বোঝায়। হিংসা, অনৃত, স্তেয় ,অব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ -এই ব্রত গুলি পালন না করাই অবিরতি।

প্রমাদ: 'প্রমাদ'শব্দের মাধ্যমে নিন্দনীয় কথা, নিদ্রা, রাগ বা আসক্তিকে নির্দেশ করা হয়। প্রমাদে সৎ কর্মের প্রতি জীবের আগ্রহ কমে যায়।

কষায়: 'কষায়'শব্দের অর্থ 'মোহ'। যে সব কামনা -বাসনা জীব বা আত্মায় কর্মপুদগল পরমাণু আকর্ষণ করে আত্মার বদ্ধদশা সূচিত করে জৈন পরিভাষায় তাকে কষায় বলা হয়। কষায় চার প্রকার-ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ।

যোগ: যোগ বলতে শারীরিক কর্ম, মানসিক কর্ম ও বাচিক কর্ম গুলিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

জৈন মতে, কর্ম পুদগল আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট হলে আত্মায় চার প্রকার বন্ধনে সৃষ্টি করে, যথা -প্রকৃতি বন্ধ, স্থিতিবন্ধ ,অনুভব বন্ধ এবং প্রদেশ বন্ধ।

প্রকৃতি বন্ধ: কর্মপুদগল জীবের সাথে সংযুক্তি হওয়ার ফলে যোগের শুভাশুভতা, তীব্রতা ইত্যাদির কারণে জীবের বিশেষ গুণ আবৃত হয়, যার ফলে বন্ধের সৃষ্টি হয়, এই বন্ধকে প্রকৃতি বন্ধ বলে।

স্থিতিবন্ধ: কর্ম পুদগলের স্বভাব একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত স্থিতিবান হয়ে পরে ধ্বংস হওয়া। এই স্থিতিকাল পর্যন্ত যে বন্ধনের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় 'স্থিতি বন্ধ'।

অনুভব বন্ধ: তৃতীয় প্রকার বন্ধ হল অনুভব বন্ধ। প্রতিটি কর্ম পুদগলের নিজ মধ্যে কার্যসিদ্ধির শক্তি থাকার জন্য যে বন্ধ হয় তাকে বলে 'অনুভব বন্ধ'।

প্রদেশ বন্ধ: কর্মপুদগল যখন মন, বচন ও কায়ার প্রভাবে জীবের সঙ্গে বদ্ধ হওয়ার জন্য আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তখন তা যোগের তারতম্যের কারণে কখনো বেশি বা অল্প সংখ্যায় আগত হয়ে জীবের সঙ্গে বন্ধ হয়, এরূপ বন্ধকে 'প্রদেশ বন্ধু' বলে।

কর্ম পুদগলের জন্য জীব উক্ত চার প্রকার বন্ধ প্রাপ্ত হয়। যা জীবের নিজ। স্বরূপকে আবৃত করে রাখে। জীব বন্ধদশা থেকে মুক্ত হলে মোক্ষ লাভ করে। এবার আমরা জৈন মতানুসারে জীবের মুক্তি বা মোক্ষ সম্পর্কে আলোচনা করব।

জীবের মুক্তি বা মোক্ষ: চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের মূল লক্ষ্যই হল আত্মার মুক্তি বা মোক্ষের পথ নির্দেশ। জৈন দার্শনিকগণও জীবের বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। জৈন মতে, আত্মার

স্বরূপে অবস্থানই হচ্ছে ‘মোক্ষ’। কর্ম পুদগলের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হলে জীব বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। এই কর্মপুগলের সংযোগ থেকে জীব মুক্ত হলে মোক্ষ অর্জন করে।তবে তার জন্য আবশ্যক আত্মায় নতুন কর্ম পুদগলের প্রবেশ রোধ করা এবং আত্মায় পূর্ব সঞ্চিত কর্মের নাশ করা। প্রথম প্রক্রিয়ার নাম সংবর এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার নাম নির্জরা।

সম্বর: সম্বর আস্রবের বিপরীত। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবের মধ্যে নতুন কর্ম পুদগলের প্রবেশ পথ রুদ্ধ হয়, তাকে সম্বর বলা হয়।

নির্জরা: যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ব সঞ্চিত কর্ম পুদগলের ক্ষয় সাধন হয়, তা হলো নির্জরা। তপস্যার দ্বারা পূর্বকৃত কর্মের বিনাশ হয়। সম্বর কর্মের প্রবাহকে রুদ্ধ করে কিন্তু নির্জরা সঞ্চিত কর্মের বিনাশ করে।
জৈন মতে সংবর ও নির্জরা- এই দুটি প্রক্রিয়া ফলপ্রদ হয় যখন জীব মোক্ষ লাভের উপায় ত্রিরত্নের অধিকারী হয়।

ভারতীয় দর্শনে মোক্ষের সাধন মার্গ হিসাবে সাধারণত তিনটি মার্গের কথা বলা হয় যথা- জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ এবং কর্ম মার্গ। জৈন মতে, একক ভাবে জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম কোনটাই মোক্ষ লাভের উপায় হতে পারে না ।এই তিনটি মার্গের সংযুক্তিই মোক্ষ লাভের উপায়। জৈনগণ এই তিনটি মার্গকে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও চারিত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জৈন দর্শনে মোক্ষ লোভের উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে উমাস্বামী ‘তত্ত্বার্থধিগম’ সূত্রের সর্ব প্রথম সূত্রে বলেছেন ‘সম্যক দর্শন -জ্ঞান -চারিত্রানি মোক্ষ মার্গঃ’[৬] অর্থাৎ সম্যগ দর্শন, সম্যগ জ্ঞান ও সম্যগ চারিত্র মোক্ষ লাভের পথ। এই তিনটি মার্গকে একত্রে জৈন দর্শনে ‘ত্রিরত্ন’বলা হয়েছে। এগুলি মানব জীবনের মহামূল্যবান রত্ন স্বরূপ, তাই এগুলোকে ত্রিরত্ন বলা হয়েছে। রত্নত্রয় নিম্নে আলোচিত হল-

সম্যক্ দর্শন: জৈন দর্শনে ‘সম্যক দর্শন’ বলতে ‘সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা’কে বোঝানো হয়েছে। এই শ্রদ্ধা কোন ব্যক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে থাকতে পারে আবার কেউ শিক্ষা ও অনুশীলনের সাহায্যে অর্জন করতে পারে,। তবে শ্রদ্ধা বলতে জৈনগণ অন্ধ ভক্তিকে নির্দেশ করেননি। তীর্থঙ্করগণ বা মনি- ঋষিরা যা বলেছেন তা অন্ধভাবে অনুসরণের নির্দেশ কোন দর্শনেই নেই । ‘শ্রদ্ধা’হল যুক্তি,বিচার ও মননের দ্বারা কথিত তত্ত্বে বিশ্বাস এবং কথিত তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্বের প্রতি অভিনিবেশ পরিত্যাগ। জৈন তীর্থঙ্করগণ কথিত তত্ত্বে রুচি, প্রীতি ও শ্রদ্ধাই হল ‘সম্যক দর্শন’[৭]। জৈন মতে, শ্রদ্ধা ব্যতীত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।

সম্যক জ্ঞান: সম্যক দর্শনের পর প্রয়োজন সম্যক জ্ঞান। জৈন তীর্থঙ্করগন ‘সম্যক জ্ঞান’ বলতে জীব ও অজীব সম্বন্ধে সংশয়, ভ্রম ও অনিশ্চয়তা মুক্ত বিশদ জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ‘সর্বদর্শন সংগ্রহে’বলাহয়েছে-

“যথাবস্থিততত্ত্বানাম্ সংক্ষেপাদ্ বিস্তরেণ বা।
যোহববোধস্তমাহুঃ সম্যগ্ জ্ঞানম্ মনীষিণঃ”[৮]।।

তত্ত্বগুলি যেভাবে অবস্থিত, তত্ত্বগুলির সেইরূপ বোধই হলো সম্যগ্ জ্ঞান। বিষয় জ্ঞান যথার্থ না হলে মোক্ষের মার্গে যাওয়া সম্ভব হয় না। জীব তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করলে অজ্ঞান প্রসূত মোহ মুক্তি হয় এবং জীব মোক্ষ সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়। কতগুলি কর্ম সম্যক জ্ঞান লাভে বাধা সৃষ্টি করে। এই বাধা অতিক্রম করতে পারলে জীবের পক্ষে কেবল জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়।

সম্যক চারিত্র: জৈন মতে ,মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য সমগ্র দর্শন ও সম্যকজ্ঞান এর সাথে সম্যক চারিত্রের প্রয়োজন হয়। যা কিছু হিতকর বা কল্যাণকর তাতে যুক্ত হওয়া এবং যা কিছু অহিতকর বা ক্ষতিকর তা থেকে বিরত থাকাই হলো ‘সম্যক চারিত্র’। জীবের মোক্ষ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সম্যক চারিত্র অত্যাবশ্যক। আত্মার বন্ধনের কারণ যেসব কর্ম তাদের প্রভাব থেকে সম্যক চারিত্রের মাধ্যমে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে জৈনগণ সম্যক চারিত্র লাভের জন্য পঞ্চমহাব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। পঞ্চমহাব্রত গুলি হলো, যথা-অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। পঞ্চমহাব্রত গুলি নিম্নে আলোচিত হলো-

অহিংসা: পঞ্চমহাবতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রত হল ‘অহিংসা’। গতি যুক্ত ও গতিহীন সর্বপ্রকার জীবের প্রতি হিংসা বা ক্ষতিকর থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে ‘অহিংসা’। শারীরিকভাবে, বাচিকভাবে ও মানসিকভাবে সর্বপ্রকার হিংসা থেকে বা ক্ষতিকর কার্য থেকে বিরত থাকা জৈনগনের পরমাদর্শ। জৈন মতে, কেবল ক্ষতি না করাই অহিংসা নয়, সর্বজীবে প্রেম বিতরণ ও কল্যাণকর কার্য সম্পাদনও অহিংসা ব্রতের অন্তর্গত।

সত্য: জৈন মতানুসারে, মিথ্যা কথন থেকে বিরত থাকা এবং সত্য বাক্য, হিত বাক্য ও প্রিয় বাক্যই হল ‘সত্যব্রত’। জৈনগণ বলেন, সত্য বাক্য বললে যদি কারো প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে তবে সেক্ষেত্রে সত্য বাক্য বলা অনুচিত।

অস্তেয়: সাধারণভাবে অস্তেয় বলতে বোঝায় কৌশল প্রবঞ্চনাদি উপায়ে অপরের সম্পদ হরন থেকে বিরত থাকা। জৈন মতে, সানন্দ দান ব্যতীত অন্যভাবে, চাতুরী বা বলপূর্বক পরদ্রব্য গ্রহন না করাই হচ্ছে ‘অস্তেয়’।

ব্রহ্মচর্য: ‘ব্রহ্মচর্য’ বলতে সাধারণত যৌন-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকে বোঝানো হয় ।তবে জৈন দর্শনে ‘ব্রহ্মচর্য’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জৈন মতানুসারে, কায়, মন ও বাক্যে সর্বপ্রকার যৌন-সম্ভোব থেকে বিরত থাকাই ব্রহ্মচর্য। জৈনগণ বলেন, নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকে মা, বোন বা কন্যা জ্ঞানে গ্রহণ করা উচিত।

অপরিগ্রহ: জৈন মতে, সকল প্রকার আসক্তি থেকে বিরত থাকাই হলো ‘অপরিগ্রহ’। বিষয়ের প্রতি আসক্তি হল জীবের দেহ ধারণ ও বন্ধনের কারণ। জৈন মতে,মোক্ষ লাভ করতে হলে বিষয়- বাসনা হতে বিরত থাকা আবশ্যক।

উক্ত পাঁচটি ব্রত শ্রমণদের নিকট কঠোরভাবে পালনীয় হওয়ায় জন্য এগুলিকে ‘মহাব্রত’ বলা হয়। জৈনগন বলেন, একজন সন্ন্যাসীকে অবশ্যই এই ব্রত গুলি পালন করা কর্তব্য। এই ব্রত অনুশীলনের দ্বারা সন্ন্যাসী বা শ্রমণ তার অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্ভাবনাকে রূপায়িত করে অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয়ে বর্তমান জীবনে মুক্তির স্বাদ অনুভব করতে পারে। কিন্তু পঞ্চমহাব্রত গুলি একজন শ্রমনের পক্ষে পরিপূর্ণ ও কঠোরভাবে পালন করা সম্ভব হলেও একজন গৃহস্থ বা শ্রবকদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই জৈনগণ পঞ্চমহাব্রতের একটা সহজ ও শিথিল রূপের কথা বলেছেন যা ‘অনুব্রত’বা ‘পঞ্চঅনুব্রত’ নামে পরিচিত। অনুব্রত গুলি পালনের মাধ্যমে একজন গৃহস্থ ত্যাগের মার্গে অগ্রসর হতে পারে। এখন আমরা অনুব্রত গুলি আলোচনা করে নেব।

'অহিংসাব্রত'কে শিথিল করলে যে অনুব্রত গুলো নিঃসৃত হয় তা হলে- (১) আত্মহত্যা করা যাবে না। (২) ভ্রুণ হত্যা করা যাবে না। (৩) নিজ ইচ্ছায় কোন গতিশীল প্রাণী কে হত্যা না করা। (৪) কোন জীবের উপর নিষ্ঠুর আচরণ না করা এবং (৫) যেসব প্রতিষ্ঠান হিংসাত্মক কর্মে যুক্ত তা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। 'সত্যব্রত'কে শিথিল করলে যেসব অনুব্রতগুলি পাওয়া যায় তা হল- ১) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথন না বলা। ২) জিনিস ক্রয় বিক্রয়ের সময় না ঠকানো । ৩) কোন ব্যক্তির গোপন কথা ব্যক্ত না করা। ৪) মিথ্যা নালিশ না করা বা মিথ্যা সাক্ষী না দেওয়া। ৫) জাল বা প্রতারণাকে সমর্থন করা যাবে না। এবং ৬) অন্যের গচ্ছিত বস্তু দেওয়ার সময় দ্বিধাবোধ না করা ইত্যাদি।

'অস্তেয়ব্রত'কে শিথিল করলে যেসব অনুব্রত গুলি নিঃসৃত হয় তা হল -১) চৌর্যবৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্যকে ক্রয় করা যাবে না।২) যা আইন বিরুদ্ধে তা থেকে বিরত থাকা।৩) পরদ্রব্য বিনা সম্মতিতে গ্রহণ করা যাবে না।৪) ব্যবসা-বাণিজ্যে অধর্ম ও অনৈতিক আচরণ না করা। এবং ৫) যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেই প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি নিজের স্বার্থে ভোগ না করা ইত্যাদি।

'ব্রহ্মচর্যব্রত'কে শিথিল করলে যে অনুব্রতগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল-১) ব্যভিচার করা যাবে না। ২) অতিরিক্ত যৌন-ক্রিয়া থেকে বিরত থাকা। ৩) বেশি বয়সকালে বিবাহ না করা। ৪) অষ্টাদশ বছর পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া। এবং ৫) প্রতিমাসে অন্ততপক্ষে কুড়ি দিন যৌন-ক্রিয়া না করা ইত্যাদি।

'অপরিগ্রহব্রত'কে শিথিল করলে যেসব অনুব্রতগুলি নিঃসৃত হয় তা হল- ১) নিজ স্বার্থে অর্থ নেওয়া বা দেওয়া যাবে না। ২) প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু সঞ্চয় করা যাবে না। ৩) ঘুষ বা উপহার গ্রহন থেকে বিরত থাকতে হবে। ৪) বাক্ দানে যৌতুক গ্রহণ না করা। এবং ৫) চিকিৎসক হিসেবে রোগীর চিকিৎসাকে দীর্ঘায়িত করা যাবে না ইত্যাদি।

উপরোক্ত অনুব্রত গুলি নেতিবাচক হলেও এগুলি পালনের মাধ্যমে সংসারী মানুষের বা শ্রাবকের আত্মশুদ্ধি ও আত্ম উপলব্ধি হয় এবং আদর্শ চরিত্র গঠিত হয়, যা শ্রাবককে ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে চালিত করে।

জৈন নীতিশাস্ত্রে, সন্ন্যাসীকে সম্পূর্ণ রূপে অহিংস হওয়ার জন্য অন্যান্য ব্রত ছাড়াও ৫টি সমিতি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যথা-

ঈর্ষা সমিতি: পথে যাওয়া আসার সময় যেন কোন জীবের হত্যা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

ভাষা সমিতি: কথাবার্তার মাধ্যমে অন্য কেউ যেন কষ্ট না পায় সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এষণা সমিতি: এমন কোন খাদ্য পানীয় গ্রহণ না করা যা কেবল তার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

আদান নিক্ষেপনা সমিতি: প্রয়োজনীয় জিনিস যত্ন সহকারে ব্যবহার করা উচিত যাতে কোন ক্ষুদ্র জীবের ক্ষতি না হয়।

পরিথাপানিকা সমিতি: ব্যবহার অযোগ্য বস্তু সাবধানে পরিত্যাগ করতে হবে।

এই পাঁচটি সমিতি সন্ন্যাসীকে অহিংসার পথ অবলম্বন করতে সাহায্য করে। সন্ন্যাসীর আচরণবিধি যদিও অত্যন্ত কঠোর, তবুও এর মধ্য দিয়েই আসক্তি ও ঘৃণা উভয়ই দূর হয়ে থাকে। জাগতিক বিরূপতা বা বিরূদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে অহিংসার অনুশীলন বা অনুসরণ প্রয়োজনীয় এবং তার সাহায্যেই মোক্ষ লাভ সম্ভব

হবে। এই জন্যই গৃহী বা শ্রাবকদের প্রাণী বা পক্ষীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর উপদেশ দিয়েছেন জৈন দার্শনিকরা[৯]।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, জৈন নীতিশাস্ত্রে কর্মবন্ধন থেকে জীবের মোক্ষ লাভকেই পরম পুরুষার্থ বা পরম নৈতিক আদর্শরুপে তুলে ধারা হয়েছে। এই কর্মবন্ধন থেকে জীবের মোক্ষ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জৈনদের বড় অবদান হচ্ছে তাদের রত্নত্রয়, যা জৈন নীতিদর্শনকে এক উচ্চাসনে আসীন করেছে। জৈনগণ একদিকে যেমন দেখিয়েছেন কিভাবে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান,সম্যক চারিত্র ও পঞ্চ মহাব্রত পালনের মাধ্যমে একজন সন্ন্যাসী বা শ্রমণ মোক্ষ এর পথে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি দেখিয়েছেন সংসারী মানুষ কিভাবে পঞ্চমহাব্রতের শিথিল রূপ 'অনুব্রত' পালনের মাধ্যমে বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে, মুক্তি কোন দানযোগ্য বস্তু নয়, যাকে জীব অনায়াসে লাভ করতে পারে। জীবকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মোক্ষ বা মুক্তি অর্জন করতে হয়। ত্রিরত্ন ও অন্যান্য ব্রত পালনের মাধ্যমে জীব কিভাবে কর্মবন্ধন থেকে মোক্ষ লাভ করতে পারে তা জৈনদার্শনিকগণ যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। যা তাদের স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় বহন করে।

তথ্যসূত্র:

1) তত্ত্বার্থসূত্র, ৫.৩৮।
2) ভারতীয় দর্শন, গোবিন্দ চরণ ঘোষ, পৃষ্ঠা -৫২।
3) তত্ত্বার্থসূত্র, ৬.১।
4) তত্ত্বার্থসূত্র, ৬.২।
5) তত্ত্বার্থসূত্র, ৮.১।
6) তত্ত্বার্থসূত্র।
7) ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, পৃষ্ঠা-১২৯।
8) সর্বদর্শনসংগ্রহ: মাধবাচার্য (অধ্যক্ষ সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী- কৃত বঙ্গানুবাদ সহ)।
9) নীতিবিদ্যা, অধ্যাপক পীযূষ কান্তি ঘোষ ও অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা -৬২।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1) গুপ্ত, দীক্ষিত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।
2) Chatterjee, Satischandra, and Datta, Dhirendra mohan, an introduction to Indian philosophy, Calcuta University press, Kolkata, 1st published, 1939.
3) Radhakrishnan, Indian philosophy, volume -1, Oxford University press, 1St published, 1923.
4) ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, সাম্মানিক নীতিবিদ্যা, বুকস সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১।
5) মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্কার ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।
6) ঘোষ, গোবিন্দ চরণ, ভারতীয় দর্শন, মিত্রম, প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ।
7) বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৭
8) সান্যাল, জগদীশ্বর, বসু, অমরেন্দ্রনাথ, বসু, দিপালী, শ্রীভূমি পাবলিকসিং হাউস, কলকাতা, দশম সংস্করণ, জুলাই, ২০১২ ।
9) ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।